আমাদের কোনো সম্পাদক নেই
তাই কোনো সম্পাদকের কলম নেই
আছে, শুধুমাত্র
আমাদের প্রিয় সম্পাদক ও প্রিয় কবি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য
এই দু-চারটি পাতা

সু নী ল দা র পা তা

এ ক টি অ প্র কা শি ত ভা ষ ণ

সু নী ল গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

এর থেকে বড়ো পুরস্কার আর পাওয়ারই দরকার নেই...

আমার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম। শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে অন্য কোনো লোক সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আমার সম্পর্কে না। আমি একবার হাততালি দিয়েও ফেলেছিলাম। কেমন লজ্জার ব্যাপার হল না নিজের ব্যাপারে হাততালি? তারপর ভাবলাম মরার পর এসব কথা বললে খুব ভালো হয়, জ্যান্ত থাকতে এসব কথার কী দরকার!

আসলে ঢাকা শহরে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী আছে। প্রত্যেকবারই এলে প্রচুর আড্ডা হয়, গল্প হয়। একটা বিপদও হয়—সন্ধ্যার পরে এত দাওয়াত খাওয়ার উপদ্রব হয় যে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। কিন্তু এতে আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। তবে ঠিক এরকম সংবর্ধনার ব্যাপার আগে কখনও হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। ঘরোয়াভাবে সকলের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হয়েছে। প্রকাশ্যে সংবর্ধনার ব্যাপার কখনও হয়নি, দরকারও ছিল না।

আমি একবার ভেবেছিলাম এই সংবর্ধনার ব্যাপারে না বলে দেব, যাব না। তবে একেবারে প্রত্যাখ্যান করলে স্পর্ধার মতো দেখায় অনেক সময়। বড়ো বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে মন হয়। আর একটা কথা হচ্ছে, যদি এটা কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থেকে হত, তাহলে হয়তো আমি দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করতাম না। অত বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে আমার যাওয়ার দরকার কী? কিন্তু এটা একটা কবিতার পত্রিকা, *কবিতা সংক্রান্তি*

নামে পত্রিকার পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

আপনারা শুনেছেন হয়তো, আমি দীর্ঘকাল একটা কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করি। কাজেই এটা একটা বেশ সমভ্রাতৃত্বের মতো যে, কবিতার পত্রিকার পক্ষ থেকে আর একটা কবিতার পত্রিকার সম্পাদককে ডাকা হয়েছে। সেইটা ভালো লেগেছে। এইজন্যই আসা। এখানে এত ভালো ভালো কথা শুনতে শুনতে মনে হয়—মরার পরে বলবে না বোধহয়, মরার পরে আমার সম্পর্কে এত ভালো ভালো কথা বলবে না।

কী লিখেছি, কীসের জন্য সংবর্ধনা জানি না। কেন-না, সত্যি কথা বলতে কী, আমি লেখার ব্যাপারে খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনোদিনই ছিলাম না। লিখে কিছু একটা করব, অমুক করব তমুক করব—এসব না। এমনি যখন যা লিখতে ইচ্ছা করেছে লিখে গেছি। অনেক বেশি লিখে ফেলেছি। এক এক সময় লোকে বলে ওরে ব্বাবা, এত বই লিখলেন কী করে। আর-একজন বলে, আপনি এত লেখেন কী করে? আমি বলি, তাও তো আমি সন্ধ্যার পর লিখি না, পুরো সন্ধ্যাটা ফাঁকা, শুধু সকালে লিখি, সন্ধ্যার পর লিখলে তো আরও ডবল লিখতে পারতাম।

এখন, এসে যায় কলমে, লিখে ফেলি। অমরত্ব বা পরে কী হবে—এসব কিছুই ভাবি না। লোকের যদি ভালো লাগে লিখব। সম্পাদকেরা যেদিন বলবেন—না, আপনার লেখা আর ভালো হচ্ছে না, আর লিখব না, বন্ধ করে দেব। কাজেই খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে এসব করছি, তা নয়। ইচ্ছে হলে করি।

আমার জন্ম হয়েছিল এখানে। আগেকার পূর্ববঙ্গে। খুব একটা, যাকে বলে অজপাড়াগাঁ, সেরকম জায়গায়। মাদারীপুর থেকেও অনেক ভেতরের একটা গ্রাম। তখন তো ভালো কোনো রাস্তাও ছিল না। পুরো বর্ষাকালে নৌকা করে যেতে হত, রাস্তা বলে কোনো জিনিস থাকত না। ধানখেত-টানখেত পুরো ডুবে যেত। সেইরকম একটা গ্রামে সাপ-খোপ হেনতেন—এসবের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছিল। বেঁচে যে আছি, এইতো যথেষ্ট। না-ও তো বাঁচতে পারতাম।

বহুবছর তো কেটে গেল। এখন হয় কী, যে, অনেক জায়গায় বসলে চারদিকে তাকিয়ে দেখি আমারই বয়স সবচেয়ে বেশি। কী করে যে হল! এই কিছুদিন আগে তরুণ লেখক ছিলাম। তরুণ লেখক-তরুণ লেখক, সবাই বলত। হঠাৎ কী করে একদম তরুণ লেখক থেকে প্রবীণ এবং বৃদ্ধ লেখক হয়ে গেলাম, জানি না।

সেই গ্রাম ছেড়ে তো চলে গেছি, চোদ্দো বছর বয়সে। আমি যে ঠিক পার্টিশনের ফলে গিয়েছি, তাও ঠিক নয়। কেন-না, আমার বাবা কলকাতায় কাজ করতেন। ফলে পার্টিশনের আগে থেকেই আমরা কলকাতায় থাকতাম। পরে হয়তো যাওয়া-আসাটা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায়ই আসতাম, মাঝে একটা বছর টানা ছিলাম। তারপর তো কতবছর কেটে গেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বোধহয় আমি এখন একটা গ্রাম্য বালক রয়ে গেছি। আমি যে এতদিন পরে, মাঝে মাঝে এখানে আসি, এলেই আমার সেই নস্টালজিক ফিলিংসটা হয়। ওই গ্রামের কথা মনে পড়ে—ওই প্রথম সাঁতার শেখা,

প্রথম পাটখেতে লুকোচুরি খেলা—এসব এখন এমনভাবে মনে পড়ে যেন রয়েই গেছি বাল্যকালের কোনো একটা জায়গায়।

এক সময় যখন কবিতা লিখে খুব দাপাদাপি করতাম, তখন অনেকে আমাকে নাগরিক কবি বলত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি নাগরিক লোক না, ভেতরে ভেতরে এখনও গ্রামের স্বভাব রয়ে গেছে এবং এখনও আমি গানবাজনা ভালোবাসি। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি পল্লিনির্ভর গানবাজনা যেগুলো। এখানকার যেমন লালন ফকিরের গান, হাছন রাজার গান, আব্বাসউদ্দীনের গান, নির্মলেন্দু চৌধুরীর গান। এসব গান বেশি ভালো লাগার কারণ বোধহয় ওই গ্রামীণ সংস্কৃতিটা আমার ভেতরে নাড়া দেয়। আমাদের বাংলার এই যে সম্পদ, এই যে গ্রামীণ সংস্কৃতি, এটাকে আমরা সাহিত্যে যদি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ওপরে উঠতে পারি।

উইলিয়াম ফকনার বলে একজন আমেরিকান লেখক আছেন, আপনারা সবাই জানেন, তাঁর যেখানে বাড়ি ছিল সেই বাড়ির দুই মাইল এলাকার ভেতরের পরিবেশ ছাড়া তিনি কখনও লেখেননি। শুধু ওই অঞ্চলটা নিয়েই লিখে গেছেন। তারপরেও তিনি বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক হয়ে গেছেন। আমাদের এখানে সতীনাথ ভাদুড়ী অনেকটা তা-ই করেছেন। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় থাকতেন। অনেকটা ওই অঞ্চল নিয়েই প্রায় সারাজীবন লিখেছেন। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু গ্রামাঞ্চল নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু লিখেছেন। কিন্তু এসব নিয়ে, এখানকার মানুষ নিয়ে লেখার আরও অনেক সুযোগ আছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন, সেলিনা হোসেন মাঝে মাঝে লেখেন, আরও অনেক লেখক-লেখিকা আছেন। কিন্তু আমাদের এই যে গ্রাম, তার যে বৈচিত্র্য, তা এখনও আমাদের সাহিত্যে বোধহয় পুরোপুরি ফোটাতে পারিনি।

আজকে যে তিনজন তরুণ লেখক পুরস্কার পাচ্ছেন—সম্পাদক হিসেবে পাচ্ছেন আমিনুল রহমান সুলতান ও লেখার জন্য পাচ্ছেন জাহানারা পারভীন ও কাজী নাসির মামুন—এই তরুণ তিনজনকে আমি আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তরুণেরাই তো আমাদের এই সাহিত্যের নদীটাকে বহমান রাখবে। আমাদের যে *কৃত্তিবাস* পত্রিকা—সেখানে কোনো বয়সের ভেদ নেই। তবে তারুণ্যকে সেখানে এখনও বেশি জায়গা দিয়ে থাকি। সেখানে কোনো কাঁটাতারের সীমারেখা আমরা মানি না, কখনও মানিনি। যখন একেবারে পাকিস্তানি আমল ছিল তখনকার *কৃত্তিবাস*-এও আল মাহমুদ ও আরও কেউ কেউ লেখা দিয়েছিলেন। এখনও অনেকেই লেখেন। আমরা বছরে দুটো পুরস্কার দিয়ে থাকি। সেটাও তরুণ কবিদের পুরস্কার। আমরা সামর্থ্য অনুযায়ী যা টাকা পাই দিয়ে থাকি। বাংলাদেশের কেউ কেউ পুরস্কার পেয়েছেন, বাংলাদেশে যাঁরা লিখছেন। আমি, এই *কৃত্তিবাস* পত্রিকা, যতদিন বেঁচে আছি, তত দিন চালিয়ে যেতে পারব বলে আশা করি। সবারই লেখা আমি চাই।

এখানে যাঁরা বিদগ্ধ কবি রয়েছেন, যাঁরা আমার সম্পর্কে বললেন, আমার শুনে

হাসি পাচ্ছিল, কারণ এরা আমার এতই ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ যে তাঁরা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে আমার প্রশংসা করবে কেন? এটার কী দরকার? এ যেন নিজের তরফে নিজেরই প্রশংসা করছে। এই রফিক আজাদ, বেলাল চৌধুরী,—অনেকেই আছেন, যাঁরা বললেন, তাঁরা আমার পারিবারিক ভাই-বোনের মতো। তাই তাঁদের প্রকাশ্য-সভায় আমার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমি তো জানি, এঁরা আমাকে কতটা ভালোবাসেন। কাজেই এঁরা তো আছেনই, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও, যাদের কাছ থেকে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি।

বেলাল বলেছে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে একটা মেয়ে বলেছিল যে, *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসটা শেষ না করে আমি মরে যেতে রাজি নই। ওটা শেষ হয়নি বলে সে মারাও যায়নি। এসব কথা শুনলে মনে হয়, তাহলে লেখার সার্থকতা আছে। এর থেকে বড়ো পুরস্কার আর পাওয়ারই দরকার নেই, আমি পেয়ে গেছি পুরস্কার।

(৪ নভেম্বর ২০০৭, জাতীয় প্রেস ক্লাবের (ঢাকা/বাংলাদেশ) ভিআইপি লাউঞ্জে
'কবিতা সংক্রান্তি' আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষণ।)